১০.১ মধ্যযুগের ইউরোপে সামন্ততন্ত্রের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য

খ্রিস্টীয় নবম ও দশম শতাব্দীতে ইউরোপের এক বিস্তৃত অঞ্চলে চরম রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং চিরাচরিত অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনগুলি ভেঙে পড়তে থাকে। এই বিশৃঙ্খলা ও রাজনৈতিক অশান্তির মধ্য থেকেই ধীরে ধীরে একটি নতুন পদ্ধতি গড়ে উঠতে থাকে। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে এই নতুন ব্যবস্থাই সামন্তপ্রথা নামে পরিচিত। সামন্ত প্রথার উৎপত্তি হয় ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক ব্যবস্থার ভাঙনের মধ্য দিয়ে আবার শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তনের মাধ্যমে এই প্রথার অবসান ঘটে। ৮০০ থেকে ১৩০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালকে ঐতিহাসিকরা সামন্তপ্রথার যুগ বলে চিহ্নিত করেছেন।

সামন্ততন্ত্রের সংজ্ঞা

মধ্যযুগ ইউরোপের ইতিহাসে এক কাল নির্ণয়কারী বৈশিষ্ট্যসহ আবির্ভূত হয়েছিল সামন্ততন্ত্র। সামন্ততন্ত্র ইউরোপের ইতিহাসে এতটাই উল্লেখযোগ্য ঘটনা যে মধ্যযুগকে অনেক সময় সামন্ততন্ত্রের যুগ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। কোনো একক সংজ্ঞার মাধ্যমে সামন্ততন্ত্রকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। প্রাচীন দাস নির্ভর সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা ভেঙে পড়েছিল। তখনই সময়ের চাহিদা অনুযায়ী উদ্ভব ঘটে সামন্ততন্ত্রের।

ইংরাজি ফিউডালিজম (Feudalism) শব্দটির বাংলা অনুবাদ সামন্ততন্ত্র। সামন্ততন্ত্র মূলত একটি সরকারি ব্যবস্থা যেখানে রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় প্রশাসন নয়, বরঞ্চ ভূস্বামীদের রাজনৈতিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীভূত থাকে। প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্যের ধনী অভিজাতরা অধীনস্থদের রক্ষার দায়িত্ব নিতেন। বিনিময়ে অধীনস্থ ব্যক্তি প্রভুকে সেবা ও সীমাহীন অনুগত্য দিত। প্রভু ও অধীনস্থদের এই সম্পর্ক হল সামন্ততন্ত্রের মূল ভিত্তি। ঐতিহাসিক মার্ক ব্লখের মতে ভ্যাসালেজ এবং ফিফ -এর যৌথ প্রক্রিয়া দ্বারা সৃষ্ট এবং ইনভেস্টিচারের মধ্য দিয়ে অনুমোদিত রাজনৈতিক, সামরিক, অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই ছিল সামন্ততন্ত্র।

বিখ্যাত ফরাসি দার্শনিক মন্তেস্কু তাঁর গ্রন্থে বলেছেন যে, 'সামন্ততন্ত্র এমন এক ঘটনা যা এই পৃথিবীতে একবারই ঘটেছে এবং যা সম্ভবত আর কখনোই ঘটবে না।' হেনরি স্পেলম্যান বলেছেন যে, 'রাষ্ট্রনীতি হিসাবে উপর থেকে বসানো একটি স্তরবিন্যস্ত ব্যবস্থা হল সামন্ততন্ত্র।' বিজিত মানুষদের নিয়ন্ত্রণ ও শাসন করার জন্য যে জার্মান ব্যবস্থা চালু হয়েছিল তাকেই সামন্ততন্ত্র আখ্যা দিয়েছেন উইলিয়াম ব্ল্যাকস্টোন। অ্যাডাম স্মিথ

বলেছেন যে, 'রোমান সাম্রাজ্যের সচ্ছলতা এবং পরবর্তীকালে ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি এবং নতুন সভ্যতার মাঝখানে সামন্ততন্ত্র ছিল অবক্ষয়ের এক সাময়িক অধ্যায়।' ইংল্যান্ডের ইতিহাসবিদ ও গবেষকদের রচনায় সামন্ততন্ত্র বর্ণিত হয়েছে ফিফডমের নিছক আইনি অথবা প্রচলিত রীতিনীতি রূপে।

ঐতিহাসিক মেয়ারের মতে সামন্ততন্ত্র হল জমির উদ্ভূত ভোগদখলের বা অধিকারের ভিত্তিতে গড়ে ওটা সমাজ ও সরকারের বিশেষ রূপ। সেটি মধ্যযুগের পরবর্তীভাগে ইউরোপে ব্যাপকতা লাভ করেছিল। ঐতিহাসিক গ্যানসফ তাঁর 'ফিউডালিজম' গ্রন্থে সামন্ততন্ত্রের সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে বলেছেন যে, মধ্যযুগে ইউরোপে লর্ড ও ভ্যাসালের মধ্যেকার সম্পর্ককে কেন্দ্র করে যে ব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছিল, তাকে সামন্ততন্ত্র বলা যায়। অন্যভাবে বলা যায়, সরকারের ক্ষমতার সঙ্গে জমিদারদের ক্ষমতার অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ হল সামন্ততন্ত্র। তাই এককথায় বলা যায়, সামন্ততন্ত্র হল ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণ ও মালিকানার একটি পন্থা এবং আত্মনির্ভরশীলতার এক অপূর্ব সমন্বয়।

সামন্তপ্রথার বৈশিষ্ট্যসমূহ : সামন্তপ্রথার বৈশিষ্ট্য নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে তীব্র মত বিরোধ আছে। ফরাসি দার্শনিক মন্তেস্কু বলেছেন যে 'সামন্ত ব্যবস্থা একটি অভিনব প্রথা এবং মধ্যযুগে একমাত্র ফ্রান্সেই তা গড়ে উঠেছিল।' তাঁর মতে সম্ভবত পৃথিবীতে এই প্রথার উৎপত্তি আর কোথাও হবে না। কিন্তু এ বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করেছেন ভলতেয়ার এবং আধুনিক গবেষক বেঞ্জামিন গেরার্ড। তাঁদের মতে হঠাৎ করে সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব ঘটেনি। এটি প্রাচীন ব্যবস্থারই একটি রূপান্তর। সামন্ততন্ত্রের বৈশিষ্ট্য নির্ধারণে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতপার্থক্যের মূল কারণ হল—একদল ঐতিহাসিক মনে করেন যে সামন্ততন্ত্রের মূল ভিত্তি হল জমি, অপর গোষ্ঠী মনে করেন এর মূল ভিত্তি ছিল গোষ্ঠীতন্ত্র। সাধারণভাবে মনে করা হয় যে সামন্ততন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসাবে চিহ্নিত করা যায় মধ্যযুগের সেই অবস্থাকে যেখানে প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থার প্রচলিত প্রথাগুলি আর তেমন ভাবে অবশিষ্ট ছিল না।

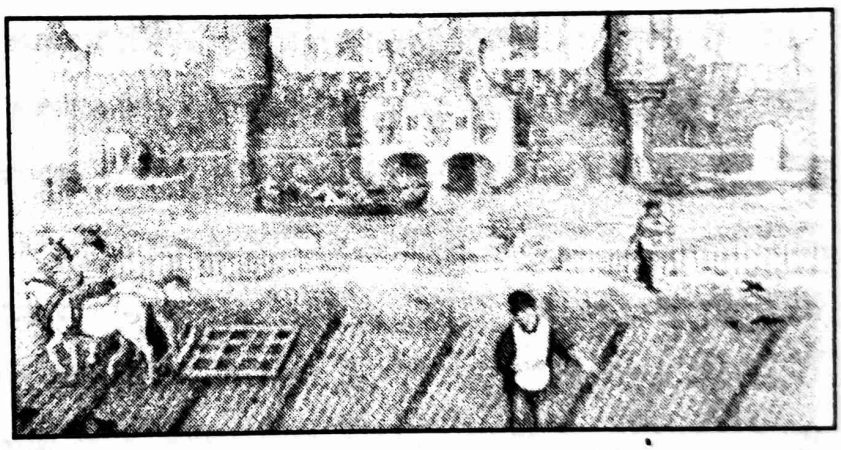

সামন্তপ্রথায় কৃষিকার্য

উর্ধ্বস্তরের সামন্তপ্রভুর সঙ্গে নিম্নস্তরের ভূমি স্বত্বভিত্তিক ভ্যাসালদের চুক্তিভিত্তিক সম্পর্কটি হল সামন্ততন্ত্রের একটি মুখ্য বৈশিষ্ট্য। লিখিত ও অলিখিত বিবিধ চুক্তির মাধ্যমে সামন্তপ্রভুর সঙ্গে তার ভ্যাসালদের সম্পর্কটি স্থিরীকৃত হত।

চুক্তির মাধ্যমে ভ্যাসাল এই অঙ্গীকার করত যে, সে সামন্তপ্রভুকে নির্দিষ্ট অর্থ কর

বাবদ আদায় দেবে এবং সামন্তপ্রভু সামরিক দায়িত্ব সহ যে সব দায়িত্ব তার উপর ন্যস্ত করবে, ভ্যাসাল তা যথার্থভাবে পালন করবে। অর্থাৎ ভ্যাসালের উপর সামন্তপ্রভুর অধিকার হল কর আদায় করা এবং প্রয়োজন ক্ষেত্রে সামরিক সাহায্য লাভ করা। ভ্যাসালদের থেকে সামন্তপ্রভু যেসব দায়িত্ব পালনের প্রতিশ্রুতি লাভ করত তাদের মধ্যে দু'টি প্রতিশ্রুতি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল—

(ক) সামন্তপ্রভুর প্রাসাদ ও জমিদারির নিরাপত্তা বিধানের প্রয়োজনে ভ্যাসাল সামরিক সহায়তা দেবে।

(খ) কোনো ভ্যাসাল বিচারালয়ের রায় অমান্য করলে অন্যান্য ভ্যাসালরা প্রভুকে রায় অমান্যকারীর বিরুদ্ধে সহায়তা করবে।

ভ্যাসালের প্রতি সামন্তপ্রভুরও বিশেষ দায়-দায়িত্ব ছিল। ভ্যাসালকে বিচারালয়ে এবং যুদ্ধক্ষেত্রে রক্ষা করা সামন্তপ্রভুর এক বিশেষ দায়িত্ব হিসেবে বিবেচিত হত।

এথেকে স্পষ্ট হয় সামন্তপ্রভু ও ভ্যাসালের মধ্যেকার চুক্তি সৃষ্ট দায়বদ্ধতা সামন্তপ্রথার মূল ভিত্তি হিসেবে কাজ করত।

সামন্তপ্রভু সামরিক সাহায্যলাভের ফলে তার জমিদারি ভ্যাসালদের মধ্যে বণ্টন করে দিত। চুক্তির শর্ত অনুসারে ভ্যাসালমাত্রই নির্দিষ্ট সংখ্যক সৈন্য দিয়ে সামন্তপ্রভুকে সাহায্য করতে বাধ্য থাকত। সাধারণত সে কারণে কৃষিকাজের প্রয়োজনে কৃষি শ্রমিকের অভাব হত। ফলে কৃষি বিঘ্নিত হত। এ কারণে দ্বাদশ শতকে এই ব্যবস্থার প্রচলন হয় যে, স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে ভ্যাসালরা সামন্তপ্রভুকে বছরে ৪০ দিন সামরিক সাহায্য দেবে। ত্রয়োদশ শতকে এই ব্যবস্থা পরিবর্তিত হয়। এই সময় থেকে ভ্যাসালরা সামন্তপ্রভুকে সৈন্য দিয়ে সাহায্য করার পরিবর্তে নির্দিষ্ট পরিমাণে অর্থ দেওয়ার অধিকার লাভ করে। তবে সামন্তপ্রভুর প্রাসাদ-দুর্গের প্রতিরক্ষার জন্য ভ্যাসালদের বিশেষ দক্ষ ও যোগ্য সৈনিকদের পাঠাতে হত। ঐসব সৈনিকদের ভরণ-পোষণের ব্যয় বহন করত ভ্যাসালরা।

সামন্ত যুগের একটি রীতি অনুসারে সামন্তপ্রভু তার জমি পরিদর্শনের জন্য সসৈন্যে বের হতেন। ঐ সময় ভ্যাসালদের [পোষ্য] ঐ সামন্তপ্রভুর ভ্রমণকালীন সমূহ ব্যয় বহন করতে হত। সামন্তপ্রভুর সঙ্গে বহু সংখ্যক লোকজনের খরচ প্রজা সাধারণের উপর বোঝা হয়ে উঠত। সে কারণে দ্বাদশ শতক থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ সামন্তপ্রভুকে দেওয়ার প্রথা স্থির হয়।

সামন্ত প্রথানুসারে সামন্তপ্রভুর আদালতে উপস্থিত হয়ে বিচারকার্যে অংশগ্রহণ করা ভ্যাসালদের এক অবশ্যপালনীয় কর্তব্য ছিল। কোনো অভিযুক্ত ভ্যাসালের অনুপস্থিতিতে তার বিচার করা হত না। তবে কোনো অভিযুক্ত ভ্যাসাল সামন্তপ্রভুর আদালতে উপস্থিত হতে অসম্মত হলে অথবা আদালতের রায় মানতে অসম্মত হলে অন্যান্য ভ্যাসালরা দণ্ডিত ভ্যাসালের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে বাধ্য ছিল।

ভ্যাসালেরা সামন্তপ্রভুকে ভূমিরাজস্ব ছাড়া আরো কয়েকটি খাতে অর্থ আদায় করে। দ্বাদশ শতকে ভ্যাসালের জমিদারির আয়তন ও অন্যান্য গুরুত্বের কথা চিন্তা করে ওই অতিরিক্ত অর্থের পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল।

সামন্তপ্রথা অনুসারে ভ্যাসালের জমিদারি বংশানুক্রমিক জমিদারি বলে গণ্য হত না। সে কারণে কোনো ভ্যাসালের মৃত্যু হলে তার জমিদারি সামন্তপ্রভুর জমিদারির অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেত। পরে অবশ্য মৃত ভ্যাসালের পুত্র কিংবা অন্য কোনো উত্তরাধিকারী নগদ অর্থ ও উপহারের বিনিময়ে মৃত ভ্যাসালের জমিদারি লাভ করতে পারত।

উল্লেখ্য, সামন্তপ্রভুর সম্মতি নিয়ে ভ্যাসালরা তাদের জমিদারির অংশ বিশেষ বিক্রয় করতে পারত। তবে এক্ষেত্রে তাদের সামন্তপ্রভুর সম্মতি লাভের জন্য প্রভূত অর্থ তার হাতে তুলে দিতে হত।

উপরিলিখিত আলোচনা সূত্রে স্পষ্ট হয় সামন্তপ্রভু ও ভ্যাসালের একান্ত ব্যক্তিগত সম্পর্কের ভিত্তিতে ভূসম্পত্তির বণ্টন হত। সে কারণে এই দুই পক্ষের কোনো এক জনের মৃত্যুর পর নতুন করে চুক্তি সম্পাদনের প্রয়োজন হত এবং প্রতি ক্ষেত্রেই সামন্তপ্রভু ভ্যাসালের কাছ থেকে অর্থ আদায় করত।

ভ্যাসালের মৃত্যুর পর সামন্তপ্রভু তার জমিদারির দায়দায়িত্ব গ্রহণ করত। কোনো ভ্যাসালের পুত্র নাবালক হলে সামন্তপ্রভু তার দায়-দায়িত্ব বহন করত। মৃত ভ্যাসালের পুত্র সাবালক হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সামন্তপ্রভু তার জমিদারি পরিচালনা করত এবং জমিদারির সমূহ আয় নিজেই ভোগ করত। ক্ষেত্র বিশেষে সামন্তপ্রভু ঐসব জমিদারি আত্মসাৎ করে নিত।

সামন্তপ্রভু মৃত ভ্যাসালের পুত্র/কন্যা প্রাপ্তবয়স্ক হলে তার বিবাহের ব্যবস্থা করত। এছাড়া মৃত ভ্যাসালের বিধবা পত্নী পুনর্বিবাহে ইচ্ছুক হলে তাকে সামন্তপ্রভুর অনুমতি নিতে হত। তবে কোনো ক্ষেত্রেই ঐ নারী সামন্তপ্রভুর কোনো শত্রুকে বিবাহ করার সম্মতি পেত না।

কোনো ভ্যাসাল কোনো উত্তরাধিকারী না রেখে মারা গেলে সামন্তপ্রভু তার জমিদারি বাজেয়াপ্ত করে নিত এবং অন্য কোনো ব্যক্তিকে ওই জমিদারিতে ভ্যাসাল হিসেবে নিযুক্ত করত। এছাড়া কোনো ভ্যাসাল তার জমিদারি পরিচালনার ক্ষেত্রে ব্যর্থ হলে সামন্তপ্রভু তার জমিদারি বাজেয়াপ্ত করে নিত এবং নতুন করে কোনো ব্যক্তিকে ঐ জমিদারিতে ভ্যাসাল হিসেবে নিয়োগ করত। এই প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ্য, কোনো ভ্যাসাল সামন্তপ্রভুর সঙ্গে প্রথাসম্মত চুক্তি ভঙ্গ করলেও সামন্তপ্রভু ঐ ভ্যাসালকে জমিদারি হতে পদচ্যুত করে তার জমিদারি বাজেয়াপ্ত করে নিতে পারত।

সামন্তপ্রভু প্রথাসম্মত চুক্তি অনুসারে ভ্যাসালদের প্রতি দায়-দায়িত্ব পালন করেনি এই অভিযোগের ভিত্তিতে তারা সামন্তপ্রভুর নির্দেশ অমান্য করতে পারত। সামন্ত প্রথা

অনুসারে জমিদারি বাজেয়াপ্ত করার মাধ্যমে সামন্তপ্রভু ভ্যাসালকে সর্বোচ্চ কঠোর শাস্তি দিতে পারত। তবে আইনসম্মতভাবে গঠিত আদালতের রায় ব্যতীত সামন্তপ্রভুর পক্ষে এ ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। এছাড়া বৈধ আদালতের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও সামন্তপ্রভুর পক্ষে কোনো ভ্যাসালকে জমিদারি হতে বরখাস্ত করা সহজ ছিল না। কোনো ভ্যাসালকে তার জমিদারি হতে উৎখাত করার জন্য সামন্তপ্রভুকে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করতে হত। সেহেতু দুর্বল ভ্যাসালকে উৎখাত করা সহজ হলেও সবল ভ্যাসালকে উৎখাত করা সহজ ছিল না। অন্যদিকে, সামন্তপ্রভুকে অর্থ সাহায্য করা এবং বিবিধ উপঢৌকন দেওয়া ভ্যাসালদের ইচ্ছাধীন বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এক্ষেত্রে তারা সামন্তপ্রভুর সামরিক পরাক্রমের বিষয়টি সর্বাগ্রে বিবেচনা করে দেখত। এথেকে স্পষ্ট হয় সামন্তপ্রভুর ও ভ্যাসালের পারস্পরিক চুক্তি সামন্তপ্রথার মূল ভিত্তি হলেও সামরিক শক্তিই চুক্তি রূপায়ণের একমাত্র কার্যকরী উপায় হিসেবে বিবেচিত।

সামন্ততান্ত্রিক সমাজ অসমভাবে বিন্যস্ত ছিল। এখানে সমাজের মূল নিয়ন্ত্রক ছিল ভূস্বামীরা বা সামন্তপ্রভুরা। শ্রমদানকারী সম্প্রদায় হিসাবে দাসের অস্তিত্ব না থাকলেও ভূমিদাস ছিল। এই অবস্থায় সামন্ততন্ত্রের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে তা হল স্বল্প সংখ্যক লর্ড বা ভূস্বামীর নিয়ন্ত্রণে ছিল গোটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা।

সামন্ততন্ত্রের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হিসাবে মনে করা হয় সুসংবদ্ধ যোদ্ধা শ্রেণি গঠন ও যোদ্ধাদের স্বার্থ সংরক্ষণ। তাই লর্ডরা ধীরে ধীরে আঞ্চলিক সমরনেতা হিসাবে যেন আবির্ভূত হতে থাকেন। তাঁরা ব্যস্ত হয়ে পড়েন সশস্ত্র অশ্বারোহী সংগ্রহে। এভাবে সামন্ত সমাজে সশস্ত্র কৃষক শ্রেণির উদ্ভব হয়। বৈদেশিক আক্রমণ মোকাবিলা ছাড়াও অভ্যন্তরীণ সংকট মোকাবিলার জন্যেও সামরিক শক্তি অর্জনও জরুরি হয়ে পড়েছিল। অষ্টম শতাব্দীতে অভিজাত বিরোধী দাঙ্গা বাধলে রোমান সম্রাট বাধ্য হন স্থায়ী ভূস্বামীদের কাছ থেকে সামরিক শক্তি সংগ্রহে।

সামন্ততন্ত্র ছিল এমন একটি ব্যবস্থা যা বিভিন্ন কারণে সমাজের সাধারণ মানুষের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও নির্ভরতার দ্রুত ও ক্রমবর্ধমান প্রয়োজন মেটাতে উদ্ভূত হয়েছিল। নিরাপত্তাহীনতার অন্যতম কারণ ছিল পরবর্তী ক্যারোলিঞ্জীয় শাসকদের আমলে সৃষ্ট নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা।

সমাজের উচ্চস্তরে শক্তিশালী যোদ্ধা শ্রেণির অবস্থান ছিল সামন্ততন্ত্রের অপর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। বলা বাহুল্য অসহায় ও দুর্বলের নিরাপত্তা রক্ষার প্রয়োজনে এদের আবির্ভাব ঘটেছিল। পরবর্তীকালে কেন্দ্রীয় শক্তির দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে এরা বিচ্ছিন্নতাকামী শক্তিতে পরিণত হয়।

স্থাবর বা ভূমিসম্পত্তির মালিকানার শ্রেণিবিন্যাস ছিল এই প্রথার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অভিজাত শ্রেণির অধীনে যে বিশাল ভূসম্পত্তি ছিল তা এককভাবে নিয়ন্ত্রণ করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই তিনি চাষবাস ও অন্যান্য কাজে অধীনস্থ প্রজা বা ভ্যাসালদের

নিয়োগ করতেন। এভাবে দেখা যায় যে লর্ড ও ভ্যাসালের মধ্যবর্তী স্তরে অসংখ্য মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণির উদ্ভব হয়।

সামন্ততন্ত্রের যুগটি ছিল একটি দুর্বল মুদ্রা ও অর্থনীতির যুগ। প্রধানত এই দুর্বলতার ফল হিসাবে পরবর্তীকালে একটি বিশেষ সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন প্রথা হিসাবে ম্যানর গড়ে ওঠে। তাই বলা যায় যে, ম্যানর ছিল মূলত একটি সাম্রাজ্যিক কাঠামো যার সীমানার মধ্যে বাস করত লর্ড ও তার অধীনস্থ প্রজারা, যারা লর্ডের জমিতে চাষ আবাদের মাধ্যমে ম্যানর ব্যবস্থাকে পুনরুজ্জীবিত করেছিল। অতএব ম্যানর ভিত্তিক উৎপাদন ছিল সামন্ততন্ত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

শর্তসাপেক্ষে সামন্তপ্রভু কর্তৃক অধীনস্থ প্রজাকে রাজস্বের বিনিময়ে নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের স্বত্বদান ছিল সামন্ততন্ত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই শর্তগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল প্রজাকর্তৃক নানা প্রকার কর ও বাধ্যতামূলক বেগার শ্রমদান, ধীরে ধীরে বহু অঞ্চলে স্বাধীন কৃষকের অস্তিত্বের অবসান ঘটে এবং শ্রেণি সার্ফ বা ভূমিদাসে পরিণত হয়।

সামন্তপ্রথার সঙ্গে সম্পৃক্ত কতকগুলি বৈশিষ্ট্য হল পরস্পরের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল নিম্নস্তরের প্রযুক্তি, অনুন্নত শ্রম বিভাজন এবং গ্রামীণ সমাজের ভোগের জন্য উৎপাদন।

একটি দুর্বল কেন্দ্রীয় শক্তির উপস্থিতি ছিল সামন্তপ্রথার অন্যতম রাজনৈতিক বা শাসনতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য। আঞ্চলিকতাবাদের স্বীকৃতি ছিল সামন্ততন্ত্রের মূলমন্ত্র। এই আঞ্চলিকতার ধারক ও বাহক ছিলেন সামন্ত ও অভিজাত শ্রেণি যাঁরা নিজ স্বার্থে সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের উপর নিজ প্রভাবিত অঞ্চল গড়ে তুলেছিলেন। সেখানে রাজার কার্যত কোনো কর্তৃত্ব ছিল না।

সামন্ততন্ত্রের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মূল ভিত্তি ছিল জমি, কারণ অধিকৃত জমির পরিমাণ একজন সামন্তপ্রভুর আভিজাত্য ও ক্ষমতার দ্যোতক। যার যতবেশি জমি ছিল সে ততবেশি ভ্যাসাল ও ভূমিদাস নিয়োগ করতে পারত। ফলে তার পক্ষেই সম্ভব ছিল উর্ধ্বতন লর্ডকে সব থেকে বেশি সাহায্য করা।

ভূস্বামীদের মালিকানাধীন বা অধিকারভুক্ত বড়ো বড়ো জমিদারিতে অধীনস্থ শ্রমজীবী মানুষের শ্রমে উৎপাদিত কৃষিজাত ও হস্ত শিল্পজাত পণ্যের যে উৎপাদন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় তা সামন্ততন্ত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই কারণেই মার্কসীয় বিশ্লেষণে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা ইউরোপকে আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে যুক্ত করেছিল। অর্থাৎ এই পথ ধরেই ইউরোপের ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার উদ্ভব ও বিকাশের পথ সুগম হয়েছিল।

ঐতিহাসিক মরিস ডব মনে করেন যে 'সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার সহজাত রক্ষণশীলতা তার অবক্ষয়ের অন্যতম কারণ ছিল।' চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে

পশ্চিম ইউরোপের আর্থ-সামাজিক কাঠামোয় সামন্ততন্ত্রের প্রভাব ক্রমশই ক্ষীণ হয়ে আসে। এই পদ্ধতি বা ব্যবস্থা বিকশিত হওয়া যেমন সময়সাপেক্ষ ছিল অনুরূপভাবে এর অবসান ঘটেছিল ধীর গতিতে। বলাবাহুল্য এই অবসানের প্রক্রিয়াও ইউরোপের সর্বত্র সমগতি সম্পন্ন ছিল না।